

শরিয়্যার দৃষ্টিতে রাষ্ট্র

ড. ইউসুফ আল কারজাভি (রহ.)

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

অনূদিত



গার্ডিয়ান

পাবলিকেশন্স

সূচিপত্র

◇ পরিভাষা	১৩
◇ ইলাহি সংবিধান	১৫
◇ ভূমিকা	১৬

শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি : প্রসঙ্গ কিছু কথা

◇ ইসলামি ফিকহের ব্যাপকতা	২১
◇ শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি	২১
◇ ইসলামি শাসন কি দ্বীনের শাখাগত বিষয় না মৌলিক	২২
◇ ‘আল্লাহর শাসন-কর্তৃত্বের দর্শন’ ইসলামি আকিদার অংশ২৬	
◇ রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে আমাদের উদাসীনতা	২৮
◇ ইসলামি রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে আধুনিক রচনাবলি	২৯
◇ রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে আলিম ও চিন্তাবিদদের বিভিন্ন রচনাবলি৩১	
◇ আধুনিক রাষ্ট্রপরিচালনায় যে পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত৩৪	
◇ শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতির তাৎপর্য	৩৫
◇ সিয়াসাহ শব্দের শাব্দিক অর্থ	৩৭
◇ রাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হওয়ার মাপকাঠি	৩৯
◇ প্রাচীন আলিমদের বর্ণনায় রাষ্ট্রনীতি	৪২
◇ শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতির বিষয়ে ইবনে আকিলের প্রাচীন বিতর্ক৪৩	
◇ ইবনুল কাইয়্যিমের পর্যালোচনা	৪৪
◇ রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে নববি দিকনির্দেশনা	৪৫
◇ রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে খোলাফায়ে রাশেদিনের দিকনির্দেশনা ৪৬	
◇ শরিয়াহ ও সিয়াসাহ : ইবনুল কাইয়্যিম কর্তৃক প্রত্যাখ্যান৪৯	
◇ শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে ইমাম আহমাদের নির্দেশনা৫১	
◇ সাময়িক ও আংশিক রাষ্ট্রনীতি	৫৩

শাসকের অভিমত এবং তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার পরিধি

◇ শাসকের অভিমত	৫৫
◇ ইমাম (শাসক) কে	৫৬
◇ ইসলামি রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালনা করা হবে	৫৬

রায় ও শরিয়ায় তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার পরিধি

◇ রায় শব্দের অর্থ	৫৮
--------------------	----

◈ আমাদের ফিকহি ঐতিহ্যে রায়	৬০
◈ রায়ের নিন্দায় সাহাবিদের বাণী	৬০
◈ আসহাবুর রায়ের পক্ষ থেকে ওপরের বর্ণনাসমূহের জবাব	৬৫
◈ ইবনুল কাইয়্যিমের বিশ্লেষণ	৭০
◈ রায় তিন প্রকার	৭০
◈ বাতিল রায় এবং এর প্রকারভেদ	৭২
◈ প্রশংসিত রায় এবং এর প্রকারভেদ	৭৩
◈ যে রায়ের ব্যাপারে উম্মাহর পূর্ববর্তী-পরবর্তী সবাই একমত	৭৭
◈ শরিয়ার আলোকে ইজতিহাদকৃত রায়	৭৮
◈ কাজ্জিত রায়	৮০
◈ শাসক কর্তৃক ইজতিহাদ করার প্রয়োজনীয়তা	৮১
◈ ইমাম বা শাসকের অভিমত কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ	৮১
◈ যে বিষয়ে ইমামকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে	৮৬
◈ আমরা মতভিন্নতাকে স্বাগত জানাই	৯৩
◈ মাসলাহা মুরসালার পরিচয়	৯৫
◈ ইমাম গাজালি ও মাসলাহা মুরসালা	৯৬
◈ গ্রহণযোগ্যতার দিক দিয়ে মাসলাহা মুরসালার শ্রেণিবিভাগ	৯৬
◈ সাহাবি কর্তৃক মাসলাহাকে বিবেচনা	১০৭
◈ অনুসৃত মাজহাবসমূহে মাসলাহা গ্রহণের পরিধি	১০৯
◈ মাসলাহা মুরসালাকে দলিল গ্রহণে চার মাজহাবের মতভিন্নতা	১১০
◈ মাসলাহা বাস্তবিক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা	১১৪
◈ মাসলাহানির্ভর বিধিবিধানসমূহের পরিবর্তন	১১৫
◈ আধুনিক যুগের ফিকহ ও মাসলাহা	১১৬
◈ মাসলাহার প্রতি বর্তমান যুগের মানুষের মুখাপেক্ষিতা	১১৭
◈ কিছু ক্ষেত্রে ইমামের রায় কার্যকর হয় না	১১৯

শাসকের রায় কার্যকর হওয়ার শর্ত

◈ গুরার ব্যাপারে ইমাম বা শাসকের অবস্থান	১২১
◈ গুরা কি ঐচ্ছিক না আবশ্যিক	১২৫
◈ সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় অগ্রাধিকার পাওয়ার দলিলসমূহ	১২৫
◈ মূলনীতির গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত	১২৮
◈ মুসলিমরা আরোপকৃত শর্ত মানতে বাধ্য	১২৮
◈ জনগণের ব্যাপারে শাসকের কার্যাবলি মাসলাহানির্ভর হতে হবে	১৩১
◈ ইবাদত ও অভ্যাসের মধ্যে পার্থক্যকরণ	১৩৫

◈ ইবাদতসমূহকে বিনা বাক্যে গ্রহণ	১৩৫
◈ অভ্যাস ও মুয়ামালাতের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত	১৩৭
◈ দ্বীনি বিষয়ে অনুকরণ ও দুনিয়াবি বিষয়ে আবিষ্কার	১৩৮
◈ পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে শাসকের রায়ের পরিবর্তন	১৪১
◈ গনিমত বন্টনে আবু বকর ও উমর (রা.)-এর মধ্যে মতভিন্নতা	১৪২
◈ উমর (রা.)-এর নিকট অগ্রাধিকার প্রদানের মানদণ্ড	১৪৭
◈ অভাবহস্তকে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেওয়া	১৪৯
◈ সাইয়েদ কুতুবের মন্তব্য	১৫০
◈ সাইয়েদ কুতুবের মন্তব্য নিয়ে আমার কথা	১৫১
◈ প্রাচীন ফকিহদের মতামত	১৫২
◈ নববি রায়ের বিপরীতে কয়েকজন খোলাফায়ে রাশেদিনের রায়	১৫৪
◈ রাসূল (সা.) নিজে মাসলাহা অনুযায়ী রায় পরিবর্তন করতেন	১৫৫
◈ কর নির্ধারণে উমর (রা.)-এর রায়	১৫৭
◈ উমর (রা.)-এর রায় গ্রহণে ফকিহগণের অবস্থান	১৫৯
◈ উমর (রা.)-এর রায় বাস্তবায়নে আমাদের মতামত	১৬০
◈ ‘জিজিয়া’ শব্দটি বিলুপ্তির ব্যাপারে উমর (রা.)-এর রায়	১৬২
◈ উমর (রা.)-এর ইজতিহাদের প্রতি আমাদের মুখাপেক্ষিতা	১৬৫
◈ অন্যদের বনি তাগলিবের সাথে যুক্তকরণ	১৬৫
◈ ইমাম শাওকানির মন্তব্য	১৬৬

নস ও মাসলাহার সাংঘর্ষিকতা

◈ নস ও মাসলাহার সাংঘর্ষিকতা	১৬৮
◈ অকাট্য ও ধারণাভিত্তিক নস	১৬৮
◈ ধারণাভিত্তিক নস ও অকাট্য নসের সাংঘর্ষিকতা	১৭০
◈ অকাট্য বিষয়সমূহ পরস্পর সাংঘর্ষিক হয় না	১৭১
◈ ইমাম গাজালি কর্তৃক উল্লিখিত ঢালের উদাহরণ	১৭২
◈ ইমাম তুফির বিরোধিতা এবং তার মাজহাব নির্ধারণ	১৭৩
◈ অকাট্য নসের সাথে মাসলাহা সাংঘর্ষিক হওয়ার দাবি	১৮০

উমর (রা.)-এর প্রতি অভিযোগ

◈ উমর (রা.) কর্তৃক অকাট্য নসকে অকার্যকর করার অভিযোগ	১৮৪
◈ মুয়াল্লাফাতুল কুলুবদের জাকাত প্রদান না করা	১৮৪
◈ আধুনিক আলিমদের বিচ্যুতির উৎস : ভুল ফিকহি ইজতিহাদ	১৯২
◈ নস রহিত হওয়ার দাবি বাতিলকরণ	১৯৫

◇ মনস্তত্ত্বের প্রয়োজন এখনও ফুরিয়ে যায়নি	২০০
◇ বিজিত অঞ্চল নিয়ে বণ্টননীতি উমর (রা.) কর্তৃক প্রত্যাখ্যান	২০৩
◇ সেকুলার কর্তৃক উমর (রা.)-এর পদক্ষেপকে লুফে নেওয়া	২০৭
◇ উমর (রা.)-এর ফিকহি সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টিপাত	২০৮
◇ গনিমতবিষয়ক আয়াতের প্রতি দৃষ্টিপাত	২০৯
◇ নবিজি কর্তৃক খায়বার অঞ্চলকে বণ্টনের প্রতি দৃষ্টিপাত	২০৯
◇ উমর (রা.) কর্তৃক কুরআন থেকে প্রমাণ উপস্থাপন	২১৩
◇ পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার প্রদান	২১৮
◇ দুর্ভিক্ষের সময় চুরির দণ্ড স্থগিতকরণ	২২০
◇ সম্ভানের সম্পদ চুরি করলে পিতার হাত কতন করা হবে না	২২৫
◇ খ্রিষ্টান বা ইহুদি মহিলাকে মুসলিম কর্তৃক বিয়ে করাকে অস্বীকার	২২৭
◇ তিন তালাকের মাসয়ালা	২৩০
◇ মদপানকারীর শাস্তি বৃদ্ধি	২৩২
◇ বনু তাগলিবের খ্রিষ্টানদের ক্ষেত্রে জিজিয়া (কর) শব্দটি প্রত্যাহার	২৩৪
◇ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ মাসয়ালা	২৩৫
◇ উমর (রা.)-এর ব্যাপারে উত্থাপিত অভিযোগের জবাব	২৩৬
◇ উমরীয় মানহাজের বৈশিষ্ট্য	২৪০

শরিয়ায় রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক ফিকহের ভিত্তি ও কেন্দ্রস্থল

◇ শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতির ভিত্তি ও কেন্দ্রস্থল	২৪২
◇ অপরিবর্তনীয় ও পরিবর্তনীয় ভিত্তি	২৪২
প্রথম ভিত্তি : মাকসাদের আলোকে নসবিষয়ক ফিকহ	২৪৬
◇ ফিকহুল মাকাসিদ বিষয়ে তিনটি চিন্তাধারা	২৪৬
প্রথম চিন্তাধারা : নব্য জাহেরিয়া সম্প্রদায়	২৪৭
দ্বিতীয় চিন্তাধারা : নব্য মুয়াত্তালা সম্প্রদায়	২৬২
● একজন আইনের অধ্যাপকের অভিযোগ	২৬৮
● আইনের অধ্যাপকের যুক্তি খণ্ডন	২৭২
তৃতীয় চিন্তাধারা : মধ্যমপন্থি সম্প্রদায়	২৮২
● অভ্যাস ও মুয়ামালাতের মূলনীতি	২৯৪
● নিগূঢ় রহস্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাতই মূলনীতি—এ কথা কেন	২৯৫
● ইবাদতের ক্ষেত্রেও হিকমত ও তাৎপর্য রয়েছে	২৯৬
● নসের ওপর মাসলাহাকে প্রাধান্যের ক্ষেত্রে ইমাম তুফি	৩০৩
● জাকাত কেবল ইবাদত নয়	৩০৪

দ্বিতীয় ভিত্তি : বাস্তবতাবিষয়ক ফিকহ

- ◈ মাসলাহা পরিবর্তনের কারণে বিধান পরিবর্তন ৩১১
- ◈ সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্তনের কারণে বিধান পরিবর্তন ৩১২
- ◈ কাল পরিবর্তনের কারণে ইমাম মালেকের ফতোয়া পরিবর্তন ৩১৩
- ◈ ইমাম কারাফি কর্তৃক ফতোয়ার পরিবর্তনকে সুদৃঢ়করণ ৩১৪
- ◈ ইমাম আবু হানিফার দুই ছাত্র কর্তৃক ওস্তাদের বিপরীত ফতোয়া ৩১৬
- ◈ পরিবর্তনবিষয়ক ইবনে আবেদিনের পুস্তিকা ৩১৭
- ◈ ইমামগণ কর্তৃক শাইখের বিপরীত ফতোয়ার উদাহরণ ৩১৭
- ◈ যুগের পরিবর্তনের কারণে বিধান পরিবর্তনকে অস্বীকার ৩১৯
- ◈ মাজাল্লাতুল আহকাম আল আদলিয়া-এর ব্যাপারে মন্তব্য ৩২১
- ◈ শাইখ আলি খফিফের পর্যালোচনা ৩২২

তৃতীয় ভিত্তি : তুলনাবিষয়ক ফিকহ ৩২৪

- ◈ তুলনাবিষয়ক ফিকহের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত ধারণা ৩২৫
- ◈ কুরআন থেকে ‘ফিকহুল মুয়াজানাত’-এর সমর্থনে বিভিন্ন দলিল ৩২৭
- ◈ বাস্তব জীবনে ‘ফিকহুল মুয়াজানাত’-এর চর্চা কঠিন ৩২৯
- ◈ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য ৩৩০

চতুর্থ ভিত্তি : অগ্রাধিকার প্রদানবিষয়ক ফিকহ ৩৩১

- ◈ দ্বিনি সম্পর্কে অন্য সকল সম্পর্কের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান ৩৩৩
- ◈ মূলনীতিকে শাখা-প্রশাখার ওপর অগ্রাধিকার প্রদান ৩৩৩
- ◈ আকিদাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে ৩৩৩
- ◈ আমলগত দিকের ওপর জ্ঞানগত দিক প্রাধান্য পাবে ৩৩৫
- ◈ রোকনি ফরজ ৩৩৬
- ◈ অকাট্য বিধিবিধান ৩৩৭
- ◈ নৈতিক মূল্যবোধ ৩৩৭
- ◈ মাসলাহাসমূহকে স্তরভিত্তিক গুরুত্বারোপ ৩৩৭
- ◈ দ্বীন রক্ষা জীবন রক্ষার আগে ৩৩৮
- ◈ জীবন রক্ষা ৩৩৮
- ◈ আকল রক্ষা ৩৪০
- ◈ বংশ রক্ষা ৩৪০
- ◈ সম্পদ রক্ষা ৩৪১
- ◈ ফরজে আইন ও ফরজে কেফায়া ৩৪২
- ◈ ফরজ ইবাদতের পর নফল ইবাদতের স্থান ৩৪৩
- ◈ নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে পরস্পর অগ্রাধিকার প্রদান ৩৪৩
- ◈ কুফরির পর কবিরার গুনাহের স্থান ৩৪৫

◈ কবির গুনাহের পর সগিরা গুনাহের স্থান	৩৪৬
◈ সগিরা গুনাহের পর সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের স্থান	৩৪৭
পঞ্চম ভিত্তি : পরিবর্তনবিষয়ক ফিকহ	৩৪৯
◈ নিজেদের পরিবর্তন	৩৫০
◈ আকিদা-বিশ্বাস ও ধ্যানধারণার পরিবর্তন	৩৫২
◈ পরিবর্তনবিষয়ক ফিকহের মূলনীতি	৩৫৩
◈ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তিনটি মূলনীতির প্রতি লক্ষ রাখা আবশ্যিক	৩৫৫
◈ জরুরত (অনিবার্য প্রয়োজন)-কে বিবেচনায় আনা	৩৫৫
◈ দুটি ক্ষতির লঘুতর ক্ষতিতে লিপ্ত হওয়া	৩৫৬
◈ ক্রমধারা অনুসরণ	৩৫৭
◈ ক্রমধারা বলতে আমরা কী বুঝি	৩৫৮
◈ উমর ইবনে আবদুল আজিজ ও ক্রমধারা	৩৫৮

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালায়; যিনি জগৎসমূহের মালিক। পবিত্র সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক ওই মহামানবের ওপর; যিনি বিশ্ববাসীর জন্য রহমত এবং সকল মানুষের জন্য হুজ্জত (দলিল)। তিনি আমাদের নেতা, ইমাম, আদর্শ, প্রিয়ভাজন ও শিক্ষক মুহাম্মাদ (সা.)। একইভাবে সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার, সাহাবি এবং যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর পথে চলবে, তাঁদের ওপর।

অতঃপর, এই কিতাবটা হলো নাহুওয়া ওয়াহদাতিন ফিকরিয়্যাতিন লিল আমিলিনা লিল ইসলাম সিরিজের চতুর্থ খণ্ড, যার শিরোনাম হলো, আস-সিয়াসাহ আশ-শরইয়্যা আলা দাওয়া নুসুসিস শারিয়াতি ওয়া মাকাসিদিহা। এই কিতাবের আলোচনা ইমাম হাসানুল বান্নার বিশ মূলনীতি-এর পঞ্চম মূলনীতির আলোকে আবর্তিত হবে।

এই মূলনীতিতে ইমাম বান্না একজন শাসক (খলিফা বা রাষ্ট্রপতি) ও তার প্রতিনিধির ওপর অর্পিত শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। একইভাবে আরও আলোচনা করেছেন রাষ্ট্রপরিচালনা, প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা নিয়ে শাসকের অভিমত, তা বিবেচিত হওয়ার সীমানা, কোন কোন ক্ষেত্রে তা কার্যকর হবে? (ইমাম হাসানুল বান্না শাসকের অভিমত কার্যকর হওয়ার তিনটি ক্ষেত্র নির্ধারণ করেছেন তা হলো—যেক্ষেত্রে সরাসরি নস নেই, যা একাধিক ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে ও মাসলাহা মুরসালা^১), কার্যকর হওয়ার শর্ত কী? পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে এই অভিমত কী পরিবর্তিত হবে, নাকি কোনো পরিবর্তন ও পরিমার্জন ছাড়াই অপরিবর্তিত থাকবে? শুরার ব্যাপারে শাসকের অবস্থান কী? এবং ইবাদত ও মুয়ামালা (লেনদেন)-এর ক্ষেত্রে শাসকের অভিমত কি সমানভাবে কার্যকর হবে নাকি মাকসাদ (উদ্দেশ্য) ও ইল্লাতের (কার্যকারণ) দিক দিয়ে বা সাধারণভাবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে?

ইমাম হাসানুল বান্না বলেন—‘যেক্ষেত্রে সরাসরি নস (কুরআন ও হাদিসের ভাষ্য) নেই, যা কয়েকটি ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে এবং মাসলাহা মুরসালায় ক্ষেত্রে ইমাম বা তার প্রতিনিধির রায় তথা অভিমত কার্যকর হবে; যতক্ষণ পর্যন্ত তা শরিয়ার মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। পাশাপাশি পরিবেশ-পরিস্থিতি, সামাজিক রীতিনীতি ও অভ্যাস অনুযায়ী শাসকের অভিমত পরিবর্তিত হবে। ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, অন্তর্নিহিত অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত না করে বন্দেগি করা আর স্বভাবগত বিষয়ের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, অন্তর্নিহিত রহস্য, হিকমত ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা।’

^১ মাসলাহা মুরসালা দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত একটি বাক্য। সাধারণ অর্থে মাসলাহা হলো—প্রত্যেক ওই জিনিস, যাতে সৃষ্টজীবের জন্য কল্যাণ রয়েছে। হোক সেটা দুনিয়াবি কিংবা পরকালীন কল্যাণ। আর মুরসালা হচ্ছে উন্মুক্ত। চলমান। যা কোনো কিছু দ্বারা আবদ্ধ নয়। আবার কোনো কিছুর মাধ্যমে তার গতিও রুদ্ধ নয়।

ফিকহি পরিভাষায়—বান্দার জন্য যেসব কল্যাণ সংরক্ষণ করা শরিয়ত প্রণেতা উদ্দেশ্য করেছেন, যেমন : মানুষের দ্বীন, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, বংশধারা ও সম্পদের সংরক্ষণ ইত্যাদি। শরিয়ত প্রণেতার এসব উদ্দেশ্যকে সুরক্ষিত ও সংরক্ষণ করার নামই হলো মাসলাহা মুরসালা। দ্র. ফখরুর রাজি, আল মাহসুলু ফি ইলমিল উসুল : ২/২২০

ইমাম হাসানুল বান্না কর্তৃক ইঙ্গিতকৃত উপরিউক্ত বিষয়াদি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। প্রসঙ্গক্রমে আমরা শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি সংশ্লিষ্ট নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও বর্তমান যুগে এগুলোর ঝুঁকি নিয়ে পর্যালোচনা করেছি। যেমন : নববি অভিমত ও এর পরিবর্তন, খোলাফায়ে রাশেদিনের অভিমত ও এর পরিবর্তন এবং শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নে পরবর্তীদের জন্য খোলাফায়ে রাশেদিনের অভিমত আবশ্যিক হওয়ার পরিধি।

পাশাপাশি মাসলাহা মুরসালা, তৎসংশ্লিষ্ট শর্তাবলি ও নিয়মনীতি, অকার্যকর মাসলাহা, বিবেচিত মাসলাহা এবং শুরাব্যবস্থা ও শাসকের জন্য তা আবশ্যিক হওয়ার পরিধি নিয়ে আলোচনা করেছি।

একইভাবে ‘শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক ফিকহ’ যেসব ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাও আলোচনা করতে ভুলিনি। তা হলো—ফিকহুল মাকাসিদ, ফিকহুল ওয়াকিয়, ফিকহুল মুয়াজানাত, ফিকহুল আওলাবিয়াত ও ফিকহুল তাগয়ির।

কোনো সন্দেহ নেই, শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের যুগের ফকিহ ও তৎপূর্ব ফকিহগণ জড়তার মধ্যে ছিল। আল্লাহ তায়ালা যে শরিয়াহকে প্রশস্ত করেছেন, তারা সেটাকে সংকুচিত করেছিল। তারা শাসকের জন্য সকল দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। তারা শরিয়াহবিবর্জিত রাষ্ট্রনীতি তৈরি করেছিল, যা তাদের স্বাচ্ছন্দ্যবোধ ও মনোবৃত্তিকে অবাধ বৈধতা দেয়; এমনকি তারা আল্লাহর সীমারেখা ও মানুষের অধিকারে হাত দেওয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছিল।

মধ্যমপন্থা সর্বদাই কাক্ষিত, যা বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি কোনোটাই করে না এবং পরিমাপে কমবেশিও করে না।

বর্তমান যুগে আমরা মধ্যমপন্থার প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী। বিশেষত এই বিষয়ে (শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি); যে বিষয়ে অহেতুক আলোচনা বৃদ্ধি পেয়েছে, সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত হয়ে গেছে। একইভাবে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে বিপরীতধর্মী নানা গোষ্ঠী ফতোয়া দিতে গিয়ে বিবাদে জড়িয়েছে। কিছু আছে নিতান্ত অলস, যারা নিজেদের কোনো শর্তে শর্তযুক্ত এবং কোনো নিয়মে আবদ্ধ করতে চায় না। কোনো নিয়মনীতি তাদের শাসন করুক, তা তারা চায় না। তাদের ধারণা হলো—দ্বীনি প্রাণশক্তি ও শরিয়ার মাকসাদকে তারা বিচারক হিসেবে মানে; অথচ তারা দ্বীনি প্রাণশক্তি ও শরিয়ার মাকসাদ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে।

আর কিছু আছে অতি অক্ষরবাদী, নিস্প্রাণ; যারা অতীতে পড়ে থাকে, পুরাতন বস্তু নিয়ে জাবর কাটে। তারা বর্তমানে বসবাস করে না। তাদের জীবনের চারপাশে যেসব চিন্তাভাবনা তৈরি হচ্ছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে, তারা তা অনুভব করে না। তাদের মধ্যে প্রতিদিন কোনো নতুনত্ব আসে না এবং লোকেরাও তাদের অনুসরণ করে না। মূলত তারা শরিয়ার মাকসাদ ও যুগের সমস্যার ব্যাপারে বেখবর।

আর কিছু আছে মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানকারী। তারা দুটি উত্তম (পুরাতন ও নতুন), শরিয় ফিকহ ও বাস্তবতাবিষয়ক ফিকহ, পুরাতন থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ ও নতুন দ্বারা উপকৃত হওয়া, (পুরাতন) ঐতিহ্য থেকে দিকনির্দেশনা গ্রহণ ও ভবিষ্যৎকে স্বাগত জানানো এবং সামগ্রিক

উদ্দেশ্য ও আংশিক নসের মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করে। একইভাবে তারা আংশিক নসকে সামগ্রিক উদ্দেশ্যে বোঝা, পরিমাপের ক্ষেত্রে ইনসারফ প্রতিষ্ঠা করা ও পরিমাপে কম না দেওয়ার চেষ্টা করে। আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশা করি।

তাদের অবস্থা মধ্যমপন্থীদের মতো। তারা ওপরের দুই গোষ্ঠীর কোনো গোষ্ঠীকে সম্বলিত ও অভিভূত করতে পারে না।

কিন্তু তাদের ঘিরেই আকাজক্ষার জাল বোনা যায়। এদের মাধ্যমেই ইসলামি আকিদা, শরিয়াহ, আদর্শ ও সভ্যতা অনুযায়ী উম্মাহর মুক্তি ও সমৃদ্ধি আশা করা যায়, যারা শরিয়ার সুদৃঢ় বিষয় ও যুগের পরিবর্তিত বিষয়ের মধ্যে তুলনা করে এবং পুরাতন ঐতিহ্য থেকে পাথেয় হিসেবে ‘আলো’ গ্রহণ করে; ‘বাধা প্রদানকারী বিধিনিষেধ’ নয়। একইভাবে কল্যাণকর পুরাতন ও উপকারী নতুনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

এই বিষয়টি আমরা এই কিতাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। আর যারা মাকাসিদের নামে শরিয়ী নসসমূহকে অকার্যকর করতে চায় এবং উমর (রা.)-এর ইজতিহাদকে নিজেদের জন্য ঢাল হিসেবে গ্রহণ করতে চায়, তাদের যুক্তি খণ্ডন করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো—এ বিষয়টি অনেকের কাছে ছড়িয়ে পড়েছে।

আমরা অখণ্ডনীয় ও অকাট্য দলিল-প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট করেছি, উমর (রা.) কখনো স্পষ্ট কোনো নসকে অকার্যকর করেননি; বরং তা কল্পনাও করা যায় না। কেননা, তিনি সুস্পষ্ট নস এবং সে অনুযায়ী ফয়সালার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন।

অতঃপর আমরা ‘নস ও মাসলাহা পরস্পর সাংঘর্ষিক হওয়া’ ও তৎসংশ্লিষ্ট নীতিমালা এবং অকাট্য নস ও ধারণাভিত্তিক নসের পার্থক্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। প্রখ্যাত হাম্বলি ফকিহ নাজমুদ্দিন তুফির অভিমত ও তাঁর বিখ্যাত মন্তব্য ‘মাসলাহার নামে নসকে অকার্যকর করা’ নিয়েও আলোচনা করেছি। লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছে, মাসলাহার নামে অকাট্য নসকে অকার্যকর করা যাবে—এ কথা তিনি বলেছেন। অথচ তিনি এমন মন্তব্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমরা তাঁর ‘স্পষ্ট মন্তব্য’ থেকে তা প্রমাণ করেছি।

আবার শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক ফিকহের ভিত্তিসমূহ আলোচনা করেছি। তা হলো—ফিকহুল মাকাসিদ, ফিকহুল ওয়াকিয়, ফিকহুল মুয়াজানাত, ফিকহুল আওলাবিয়াত ও ফিকহুল তাগয়ির। স্থান অনুযায়ী প্রত্যেকটা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করেছি।

ওপরের আলোচনা থেকে আমাদের এবং প্রত্যেক সুবিচারক পাঠকের নিকট স্পষ্ট হয়—শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি কোনো জড় ও বদ্ধ বিষয় নয়; বরং জীবনের গতিতে গতিশীল, সমাজের উন্নতিতে উন্নত ও চিন্তার নতুনত্ব নতুন একটা বিষয়।

‘শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি’ মূলনীতি, সামগ্রিক উদ্দেশ্য ও অকাট্য দলিলের আলোকে সংশ্লিষ্ট শাখা-প্রশাখা, আংশিক নস ও ধারণাভিত্তিক নস বোঝার সুযোগ করে দেয়। একইভাবে তা সুদৃঢ় মূলনীতির আওতায় ‘পরিবর্তিত বিষয়সমূহ’ ও অকাট্য দলিলের আওতায় ‘ধারণাভিত্তিক দলিলসমূহ’ বোঝার চেষ্টা করে।

‘শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি’ পরিবর্তনযোগ্য উপায়-উপকরণ, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া এবং অপরিবর্তনযোগ্য মহান মূল্যবোধের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতাকে সুযোগ করে দেয়।

অন্যদের কাছে যে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উপায়-উপকরণ ইত্যাদি রয়েছে, তা থেকে (উপকারী) কিছু গ্রহণ করার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই, যতক্ষণ না তা বাহকদের জন্য বিপরীত আকিদা-বিশ্বাস বহন করে। প্রজ্ঞা হলো মুমিনের হারানো ধন। সুতরাং সে যেখানেই তা পাবে, সে-ই হবে তার একমাত্র অধিকারী।

আশা করি, (শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি) এই শিরোনামটি মার্কসবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ ও পাশ্চাত্যপন্থীদের বিরক্ত করবে না, যাদেরকে দ্বীন ও শরিয়ার সাথে রাষ্ট্রনীতির যেকোনো ধরনের সম্পৃক্ততাই উদ্ভিগ্ন করে এবং তারা অব্যাহতভাবে তথাকথিত ‘রাজনৈতিক ইসলাম’-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ করে যায়। মূলত তারা দ্বীনকে মানবজীবনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক দিকনির্দেশক হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে। তারা আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর সৃষ্টি থেকে পৃথক করতে চায়, যাতে তিনি তাদের আদেশ-নিষেধ করতে না পারেন।

আমাদের কী করার আছে, যখন এই পরিভাষাটি আমাদের আবিষ্কার না হয়ে প্রাচীন আলিমদের আবিষ্কার হয়ে থাকে? আমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের দাঈ, যেটাকে তারা ‘রাজনৈতিক ইসলাম’ বলে থাকে!

ইমাম হাসানুল বান্না ২০টি মূলনীতির কথা বলেছেন। শরিয়ার দৃষ্টিতে রাষ্ট্র বইটি পঞ্চম মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত। এই মূলনীতিকে তিনি বলেন—‘যেক্ষেত্রে সরাসরি নস (কুরআন ও হাদিসের ভাষ্য) নেই, যা কয়েকটি ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে এবং মাসলাহা মুরসালার ক্ষেত্রে ইমাম বা তার প্রতিনিধির রায় তথা অভিমত কার্যকর হবে; যতক্ষণ পর্যন্ত তা শরিয়ার মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। পাশাপাশি পরিবেশ-পরিস্থিতি, সামাজিক রীতিনীতি ও অভ্যাস অনুযায়ী শাসকের অভিমত পরিবর্তিত হবে। ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো—অন্তর্নিহিত অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত না করে বন্দেগি করা আর স্বভাবগত বিষয়ের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, অন্তর্নিহিত রহস্য, হিকমত ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা।’

আমি আশা করছি, এই কিতাবটি ‘শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি’ বাস্তবায়নের পথে একটি পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হবে। যে রাষ্ট্রনীতির ভিত্তি হলো প্রশস্ততা, সহজতা, দায়িত্ববোধ ও শৃঙ্খলাবোধের ওপর, সংকীর্ণতা, কঠোরতা, অলসতা ও শিথিলতার ওপর নয়। যে রাষ্ট্রনীতি কল্যাণসমূহ বাস্তবায়ন করে, অকল্যাণসমূহ প্রতিহত করে, মাকাসিদ (অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য) ও অগ্রাধিকার নীতিকে গুরুত্ব দেয় এবং উম্মাহর স্বকীয়তা ও মধ্যমপন্থা নীতি বাস্তবায়ন করে। এই পদ্ধতিতেই আল্লাহর দ্বীন সমুন্নত হয় এবং মানুষের দুনিয়াবি জীবন সুসংগঠিত হয়।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ-

‘হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথপ্রদর্শনের পর আপনি আমাদের অন্তরকে বক্র করবেন না এবং আপনার নিকট থেকে আমাদের অনুগ্রহ দান করুন। আপনিই সবকিছুর দাতা।’^২

শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি : প্রসঙ্গ কিছু কথা

ইসলামি ফিকহের ব্যাপকতা

রাষ্ট্রনীতি বা শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি সুবিশাল ইসলামি ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। যে ফিকহ পুরো মানবজীবনকে অন্তর্ভুক্ত করে। ইসলামি ফিকহে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার সাথে মানুষের সম্পর্ক কী রকম হবে, কেমন সম্পর্ক হবে তার ব্যাখ্যা ও ব্যান। যেটাকে আমরা বলি ‘ফিকহুল ইবাদত’। তেমনই রয়েছে মানুষের সাথে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সম্পর্কের বর্ণনা, যা ‘ফিকহুল হালাল ওয়াল হারাম’-এর আলোচ্য বিষয়। আরও রয়েছে ব্যক্তির সাথে পরিবারের সম্পর্ক তথা বিবাহ, তালাক, অসিয়ত ও উত্তরাধিকার ইত্যাদির বর্ণনা। যেটাকে আইনবিদগণ ‘পারিবারিক আইন’ বলে থাকে। পাশাপাশি ইসলামি ফিকহে রয়েছে বিভিন্ন আচার-আচরণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সাথে সমাজের সম্পর্কের বিবরণ। যেটাকে বর্তমানে ‘নাগরিক ও ব্যবসায়িক আইন’ বলা হয়।

শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি

ইসলামি ফিকহে রয়েছে ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের, শাসকের সাথে শাসিতের, রাজার সাথে প্রজার এবং সরকারের সাথে জনগণের সম্পর্কের আলোচনা। বর্তমান যুগে যেটাকে সাংবিধানিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও আন্তর্জাতিক আইন নামে অভিহিত করা হয়। মূলত আমরা রাষ্ট্রনীতি বা শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি বলতে উপরিউক্ত বিষয়কে বুঝিয়ে থাকি। আমাদের ফকিহগণ রাষ্ট্রনীতিকে তাদের মাজহাব ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সাধারণ ফিকহের বিভিন্ন অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পাশাপাশি রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন : ইমাম মাওয়ারদি শাফেয়ি^৩ ও তাঁর সমকালীন আলিম ইমাম আবু ইয়ালা আল ফাররা হাম্বলি^৪-এর আল আহকাম আস-সুলতানিয়াহ। ইমামুল হারামাইন শাফেয়ি^৫ (রহ.)-এর গিয়াসুল উমাম। ইবনে তাইমিয়া হাম্বলি^৬-এর আস-সিয়াসাহ আশ-শরইয়া ফি ইসলামির রায়ি ওয়ার রায়িয়াহ ও আল হিসবাহ। ইবনে তাইমিয়ার ছাত্র ইবনুল কাইয়িম^৭-এর আত-তুরুক আল-হুকমিয়াহ। ইবনে জিমাআ^৮-এর তাহরিরুল আহকাম ফি তাদবিরি আহলিল ইসলাম। এক্ষেত্রে আরও উল্লেখ করা যায়, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রধান ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ^৯ ও ইয়াহয়া ইবনে আদম আল কুরাশি^{১০}-এর কিতাবুল খারাজ।

^৩ মৃত্যু : ৪৫০ হিজরি

^৪ মৃত্যু : ৪৫৮ হিজরি

^৫ মৃত্যু : ৪৭৬ হিজরি

^৬ মৃত্যু : ৭২৮ হিজরি

^৭ মৃত্যু : ৭৫২ হিজরি

^৮ মৃত্যু : ৭৪৯ হিজরি

^৯ মৃত্যু : ১৮২ হিজরি

^{১০} মৃত্যু : ২০৪ হিজরি

আবু উবাইদ কাসেম ইবনে সালাম^{১১} ও হুমাইদ ইবনে জানজুয়ার কিতাবুল আমওয়াল এবং ইবনে রজব হাম্বলি^{১২}-এর আল ইসতিখরাজ ফি আহকামিল খারাজ।

ইসলামি শাসন কি দ্বীনের শাখাগত বিষয় না মৌলিক

শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতির কিছু বিধান শাখাগত বিষয়ের গ্রন্থাবলি থেকে মৌলিক বিষয়ের গ্রন্থাবলি তথা উসুলুদ-দ্বীনে স্থানান্তরিত হয়েছে। অতএব, বিধানগুলোকে আকিদা, তাওহিদ ও ইলমুল কালামের গ্রন্থাবলিতে স্থান দেওয়া হয়েছে। যেমন : ইমামত ও খিলাফতবিষয়ক সকল আলোচনা। এর কারণ হলো—শিয়া ইমামিয়াগণ ‘ইমামত’-কে দ্বীনের মৌলিক বিষয় ও আকিদার অংশ মনে করে। তাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আলিমগণ ‘ইমামত’-কে আকিদার গ্রন্থাবলিতে আলোচনা করেছেন, যদিও তাদের মতে, ‘ইমামত’ দ্বীনের শাখাগত বিষয়। কেননা, তা মানুষের আমলের সাথে সম্পৃক্ত, বিশ্বাসের সাথে নয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের উপরিউক্ত অবস্থানের ফলে বেশ কিছু ইসলামি গবেষক ‘ইমামত’ ও ‘আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান মোতাবেক শাসন’-কে তুচ্ছজ্ঞান করেন। তারা বলেন—তা দ্বীনের শাখাগত বিষয়, মৌলিক বিষয় নয়।

আমরা তা সন্দেহাতীতভাবে মানছি। তবে এর অর্থ এই নয়, ‘ইমামত’ ও ‘আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান মোতাবেক শাসন’-কে তুচ্ছজ্ঞান করতে হবে। কারণ, ইসলাম শুধু কিছু আকিদা-বিশ্বাসের নাম নয়; বরং ইসলাম হলো বিশ্বাস ও আমলের সমন্বয়। ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাসকে আমলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন।

আমরা যদি ইসলামের কিছু মৌলিক ফরজ বিধান, যেমন : নামাজ ও জাকাতের দিকে তাকাই, দেখতে পাই তা মূলত শাখাগত বিষয়, মৌলিক বিষয় নয়। কারণ, তা আমলসংশ্লিষ্ট, আকিদাসংশ্লিষ্ট নয়। এতৎসত্ত্বেও বিষয়টি নামাজ ও জাকাতকে ইসলামের রুকন ও বুনিয়াদি বিষয় হতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। কারণ, নামাজ ও জাকাতের উজুবিয়াত (আবশ্যিকতা) ও রুকনিয়াত (রুকন হওয়া)-এর ঈমান ও বিশ্বাস হলো মৌলিক বিষয়, শাখাগত বিষয় নয়। এজন্য যে ব্যক্তি নামাজ ও জাকাতের ফরজিয়াত (অবশ্যপালনীয়তা)-কে অস্বীকার বা নামাজ ও জাকাতকে হেয় প্রতিপন্ন করে, তাকে কাফির, ধর্মত্যাগী ও দ্বীনহীন হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ, সে দ্বীনের জ্ঞাত ও স্বীকৃত বিষয়ের প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়েছে, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করার নামান্তর।

ঠিক তেমনি ‘ইমামত’ ও ‘আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান মোতাবেক শাসন’ শাখাগত বিষয়। তবে ‘ইমামত’ ও ‘আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান মোতাবেক শাসন’-এর বিশ্বাস, কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার চাওয়া এবং আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য নিঃসন্দেহে দ্বীনের মৌলিক বিষয় ও ঈমানের অঙ্গ।

এ ব্যাপারে আল্লাহর তায়ালা বলেন—

^{১১} মৃত্যু : ২২৪ হিজরি

^{১২} মৃত্যু : ৭৯৫ হিজরি

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا-

‘আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা (অর্থাৎ মুনাফিকরা) দাবি করে, আপনার প্রতি যা নাজিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাজিল করা হয়েছে, সবগুলোর প্রতি তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে; কিন্তু তারা বিচার-ফয়সালার জন্য তাগুতের দ্বারস্থ হতে চায়, অথচ তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করতে। মূলত শয়তান তাদের সুস্পষ্টভাবে বিপথগামী করতে চায়।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا-

যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহর নাজিলকৃত কিতাব এবং রাসূলের দিকে আসো, তখন আপনি দেখতে পাবেন, মুনাফিকরা আপনার থেকে ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا-

তাদের কৃতকর্মের জন্য যখন তাদের ওপর কোনো মুসিবত আপতিত হবে, তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে? তখন তারা আপনার কাছে এসে হলফ করে বলবে—আল্লাহর কসম! আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ছাড়া আর অন্য কিছু চাইনি।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا-

তাদের মনের খবর আল্লাহ ভালো করেই জানেন। সুতরাং আপনি তাদের উপেক্ষা করেন, আর তাদের উপদেশ দান করেন এবং তাদের উদ্দেশে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলুন।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا-

আল্লাহর নির্দেশে আনুগত্য করা হবে—এ উদ্দেশ্য ছাড়া আমি একজন রাসূলও পাঠাইনি। যদি তারা (মুনাফিকরা) নিজেদের প্রতি কোনো জুলুম করার পর এ পন্থা অবলম্বন করত যে, তারা আপনার কাছে ছুটে আসত, আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করত, তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়াবান পেত।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا-

কিন্তু না (তাদের অবস্থা তা নয়), তোমার প্রভুর শপথ! এরা কখনো ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক বিবাদে আপনাকে হাকিম নিযুক্ত করে, অতঃপর আপনার ফয়সালা সম্পর্কে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং বিনীতভাবে আপনার ফয়সালা গ্রহণ করে নেয়।’^{১৩}

অন্য সূরায় আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

‘তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি আর আমরা আনুগত্য করেছি। কিন্তু এর পরই তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। আসলে তারা মুমিন নয়।

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ

তাদের যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ

আর যদি তাদের প্রাপ্য কোনো অধিকারের বিষয় হয়, তখন তারা বিনীত হয়ে রাসূলের কাছে ছুটে আসে।

إِنِّي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْجِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

তাদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, নাকি তারা সংশয়ে নিমজ্জিত? আর নাকি তারা ভয় করে যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তাদের প্রতি জুলুম করবেন? আসল কথা হলো তারা জালিম।

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

মুমিনদের যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য, তখন তাদের কথা একটাই হয়ে থাকে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। এসব লোকই হবে সফলকাম।’^{১৪}

অতএব, এই অর্থে আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান মোতাবেক শাসনকে ঈমানের অংশ এবং বিনা তর্কে দ্বীনের মৌলিক বিষয় গণ্য করা যায়।

^{১৩} সূরা নিসা : ৬০-৬৫

^{১৪} সূরা নূর : ৪৭-৫১

প্রকৃতপক্ষে সংঘাতটা আমাদের ও খাঁটি সেক্যুলারদের মধ্যে, যারা সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দ্বীনকে পৃথক করে শুধু ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলে। অগত্যা বাধ্য হলে সীমিত পরিসরে মসজিদের চার দেওয়ালের মাঝে দ্বীন চর্চার অনুমতি দেয়। তাও আবার রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত মসজিদে! স্বাধীন কোনো মসজিদে নয়; যে মসজিদ সংকাজের আদেশ দেয় এবং অসংকাজের নিষেধ করে। আমাদের ও তাদের মাঝে কোনো শাখাগত বিষয় নিয়ে বিরোধ নয়; বরং দ্বীনের মৌলিক বিষয় নিয়ে বিরোধ। কারণ, বিষয়টি আল্লাহর কর্তৃত্ব বা শাসনের অধিকারসংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ, আল্লাহর কি তাঁর সৃষ্টিকে শাসন করার অধিকার রয়েছে? তাদের আদেশ ও নিষেধ করার অধিকার রয়েছে? তাদের জন্য হালাল-হারাম নির্ধারণ করার অধিকার রয়েছে?

সেক্যুলারগণ আল্লাহকে তাঁর এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। আল্লাহর চেয়ে অধিক জানার দাবি করে! তাদের ধারণা, সৃষ্টির ব্যাপারে তারা আল্লাহর চেয়ে অধিক জ্ঞাত। অতএব, বিষয়টি নিঃসন্দেহে মৌলিক ও আকিদাগত বিষয়।

‘আল্লাহর শাসন-কর্তৃত্বের দর্শন’ ইসলামি আকিদার অংশ

অনেকেই ধারণা করেন, আল্লাহর শাসন-কর্তৃত্বের দর্শন’ বিষয়টি আল্লামা আবুল আলা মওদূদী ও শহিদ সাইয়েদ কুতুবের আবিষ্কার। কেননা, তাঁরা উভয়েই এ বিষয়ে পুনরায় নতুন করে লেখালেখি শুরু করেন এবং তাঁদের রচিত গ্রন্থগুলোতে বিষয়টির পুনরাবৃত্তি ঘটান।

কিন্তু উসুলে ফিকহের কিতাবসমূহে দেখা যায়, এই শাস্ত্রের প্রাথমিক আলোচনাই হলো শরিয়াহভিত্তিক শাসন নিয়ে। যেমন : শাসক অধ্যায়, শাসক কে ইত্যাদি।

এই শাস্ত্রের প্রত্যেকেই ঘোষণা দিয়েছেন, শাসক একমাত্র আল্লাহ; কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই। তেমনি পবিত্র কুরআন একাধিক স্থানে এ বিষয়ের ঘোষণা দিয়েছে। যেমন : সূরা আনআমের ৫৭ ও সূরা ইউসুফের ৪০ নং আয়াতে।

উদাহরণ হিসেবে ইমাম গাজালি তাঁর আল মুস্তাশফা নামক কিতাবে এবং উসুলে ফিকহের মুসাল্লামুস সুবুত নামক কিতাবের ব্যাখ্যাকার যা লিখেছেন, তা উল্লেখ করা যায়। তাঁদের কথা থেকে এ কথা স্পষ্ট, আল্লাহকেই একমাত্র শাসক গণ্য করা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত ও মুতাজিলাদের নিকট স্বীকৃত বিষয়।^{১৫}

ইমাম গাজালি যা বলেছেন, তা এখানে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। তিনি বলেছেন—হুকুম বাস্তবায়নের অধিকার তাঁরই আছে, যিনি সৃজন ও আদেশ-নিষেধ করতে পারেন। কেননা, মালিকের হুকুমই অধীনস্থের ওপর বাস্তবায়িত হয়। আর যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনিই মালিক। অতএব, হুকুম ও আদেশ-নিষেধ করা অধিকার তাঁরই।

যদি নবি, শাসক, মনিব, পিতা ও স্বামী কোনো বিষয়ের আদেশ দেয় কিংবা আবশ্যিক করে, তবে সেই আদেশ তারা নিজেরা আবশ্যিক করার কারণে অপরিহার্য হয় না; বরং আল্লাহ তায়ালা তাদের আনুগত্য আবশ্যিক করার কারণে অপরিহার্য হয়। অন্যথায় প্রত্যেক সৃষ্টি অন্য সৃষ্টির ওপর বিভিন্ন বিষয় আবশ্যিক করেই যেত। অধীনস্থরা নিজেদের ওপর নানা বিষয় আবশ্যিক করে নিত।

^{১৫} দেখুন, ফাওয়াতেহুর রাহমুত শরহে মুসাল্লামুস সুবুত, আল মুস্তাশফাসহ। খণ্ড : ১

অথচ কেউ কারও চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্য এবং তিনি যাদের আনুগত্য অপরিহার্য করছেন, তাঁদের আনুগত্য আবশ্যিক।^{১৬}

পবিত্র কুরআন তাওহীদের সূরা খ্যাত সূরা আনআমে তাওহীদের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে এ বিষয়ে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে। সূরা আনআমে তাওহীদের তিনটি মৌলিক উপাদান উল্লেখ করা হয়েছে।

এক. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে প্রতিপালক হিসেবে না খোঁজা। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قُلْ اَعْيَزُ اللّٰهُ اَبْنٰى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ-

‘আপনি বলুন, আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য প্রতিপালক খুঁজব, অথচ তিনিই সবকিছুর প্রতিপালক?’^{১৭}

দুই. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ না করা। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قُلْ اَعْيَزُ اللّٰهُ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-

‘আপনি বলে দিন, আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করব, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা।’^{১৮}

তিন. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক হিসেবে না খোঁজা। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন—

اَفَعْيَزُ اللّٰهُ اُبْتَغِيْ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا-

‘তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো বিচারক অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন?’^{১৯}

সেক্যুলার ও পাশ্চাত্যপন্থিরা আল্লাহকে বিচারক, কুরআনকে (আইনের) উৎস হিসেবে মানে না। তারা শরিয়াহ থেকে নিজেদের ইচ্ছেমতো কিছু বিষয় গ্রহণ করে আবার ইচ্ছেমতো কিছু বিষয় প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহ বলেন—

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضٰى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهُمْ-

‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন কিছু গ্রহণ করার ইচ্ছা নেই।’^{২০}

তারা কুরআনের এক অংশের প্রতি ঈমান আনে এবং অপর অংশকে অস্বীকার করে। অথচ প্রকৃত ঈমানের দাবি হলো—সমগ্র কুরআনের প্রতি ঈমান আনা। আর আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়ে বনি ইসরাইলকে তিরস্কার করেছেন। তিনি বলেন—

^{১৬} আল মুস্তাশফা : ১ম খণ্ড/২৭৫, ২৭৬। তাহকিক : ড. হামজা জহির হাফিজ।

^{১৭} সূরা আনআম : ১৬৪

^{১৮} সূরা আনআম : ১৪

^{১৯} সূরা আনআম : ১১৪

^{২০} সূরা আহজাব : ৩৬

أَفْتُومُنُونَ بَبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خُزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ-

‘তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের প্রতি বিশ্বাস রাখো আর কিছু অংশ অস্বীকার করো? যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনো পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেওয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বেখবর নন।’^{২১}

রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে আমাদের উদাসীনতা

অধিকাংশ আলিম ও গবেষক মনে করেন, রাষ্ট্রনীতি তথা রাষ্ট্রপরিচালনা-সংক্রান্ত বিধিবিধান অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রে তেমন গুরুত্ব পায়নি, যেভাবে ইসলামি ফিকহের অন্যান্য শাখা গুরুত্ব পেয়েছে। যেমন : ফিকহুল ইবাদত, ফিকহুল মুয়ামালাত ও ফিকহুল নিকাহ ইত্যাদি।

এর অর্থ এই নয়, আমাদের ইলমি ঐতিহ্য ‘রাষ্ট্রপরিচালনার বিধিবিধান’ শূন্য। কারণ, যে জাতি কয়েক শতাব্দী ধরে বিশ্বসভ্যতাকে নেতৃত্ব দিয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এটা অসম্ভব। তদুপরি বিভিন্ন বিষয়াদির ক্ষেত্রে শরিয়াহই ছিল তাদের একমাত্র প্রত্যাবর্তনস্থল; যদিও কিছু কিছু রাজা-বাদশাহ, আমির-উমরা ও শাসকবর্গ নবুয়ত ও খিলাফতের রাস্তা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, আমাদের রাষ্ট্রপরিচালনা-সংক্রান্ত গবেষণা খুবই অল্প, যার অধিকাংশই ইজতিহাদ (ধর্মীয় বিধান প্রণয়নে গবেষণামূলক প্রয়াস) ও মুসলিম সমাজে মাজহাব অনুকরণের প্রবণতা বৃদ্ধির পরবর্তী যুগে সম্পন্ন হয়েছে।

ইসলামি রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে আধুনিক রচনাবলি

এই বিষয়ে বর্তমান যুগে অনেক লেখালেখি হয়েছে। যেমন : গ্যাব্রিয়েল হানোটাক্স^{২২} ও ফারাহ আন্তন^{২৩}সহ যারা ইসলামের মহান বাণী ও সভ্যতা নিয়ে বিসোধগার করেছে, তাদের জবাবে আল উরওয়াতুল উসকা নামক পত্রিকায় শাইখ মুহাম্মাদ আবদুহুর লেখালেখিসমূহ। আরও আছে তাঁর বিখ্যাত তাফসির, যা আল মানার গ্রন্থকার সংক্ষেপ করেছেন। তেমনি আল মানার পত্রিকা, তাফসিরগ্রন্থ ও আল খিলাফাহ বা আল ইমামাতুল উজমা নামক কিতাবে আল্লামা রশিদ রিদার লেখালেখি। বিখ্যাত আইনবিদ ড. আবদুর রাজ্জাক সানহুরির খিলাফতবিষয়ক গ্রন্থ, যা ড. তাওফিক শাওয়ির টীকাভাষ্যসহ আরবি ভাষায় প্রকাশিত হয়।

^{২১} সূরা বাকারা : ৮৫

^{২২} গ্যাব্রিয়েল হানোটাক্স (১৮৫৩-১৯৪৪) : রাষ্ট্রনায়ক, কূটনীতিক এবং ইতিহাসবিদ। যিনি ফরাসি ঔপনিবেশিকতার কটর সমর্থক ছিলেন।

^{২৩} ফারাহ আন্তন (১৮৭৪-১৯২২) : সাংবাদিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, রাজনৈতিক ও সামাজিক লেখক। তিনি ১৮৭৪ সালে লেবাননে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে ১৮৯৭ সালে উসমানীয় শাসকদের রোমানল থেকে বাঁচতে মিশরে চলে যান। তিনি উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিংশ শতকের প্রথম দিকে আরব বিশ্বের আলোকিত আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ও আরব ধর্মনিরপেক্ষ রেনেসাঁর অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তেমনি তিনি মিশরের সাবেক প্রধান মুফতি শাইখ মুহাম্মাদ আবদুহুর সাথে দীর্ঘ বিতর্কের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

আল ইসলাম ওয়া উসুলুল হকুম নামক গ্রন্থ : ইসলামি খিলাফত বিলুপ্তির এক বছর পর বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ১৯২৫ সালে শরিয়াহ বিচারক আলি আবদুর রাজ্জাকের **আল ইসলাম ওয়া উসুলুল হকুম** নামক বিপজ্জনক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি মুসলিম সমাজে; বিশেষ করে মিশরীয় সমাজে হইচই ফেলে দেয়। গ্রন্থটি আকারে ছোটো এবং উক্ত লেখকের উল্লেখযোগ্য আর কোনো গ্রন্থ নেই। তিনি তার গ্রন্থে এমন এক দাবি করেন, যে দাবি সুদীর্ঘ ইসলামের ইতিহাসে কেউ করেনি। দাবিটি হলো—ইসলাম কিছু বিধিবিধান-সংবলিত একটি ধর্মমাত্র। রাষ্ট্রপরিচালনার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলাম হলো মূলত আধ্যাত্মিক পয়গাম। মুহাম্মাদ (সা.)-কোনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেননি। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তাঁর পয়গামের অংশও ছিল না। মুহাম্মাদ (সা.)-কে বলা যায় দ্বীনি দাওয়াতের বাহক। কোনো শাসকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান তাঁর এই দাওয়াতকে কলুষিত করতে পারে না। রাসূল (সা.)-এর কোনো রাষ্ট্র ছিল না। তিনি কোনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত ছিলেন না, যা রাষ্ট্রনীতি ও সমজাতীয় শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়। তিনি কোনো শাসক, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বানকারী ছিলেন না।^{২৪}

গ্রন্থটি নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। গ্রন্থটির লেখক নানা দিক থেকে আক্রমণের শিকার হন; এমনকি স্বল্প সময়ে গ্রন্থটির জবাবে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়। তন্মধ্যে আছে, তৎকালীন মিশরীয় মুফতি শাইখ মুহাম্মাদ বুখিত মুতিয়ির **হাকিকাতুল ইসলাম ওয়া উসুলুল হকুম**^{২৫} নামক কিতাব এবং পরবর্তী সময়ে ‘শাইখুল আজহার’ উপাধিতে ভূষিত হওয়া আহমাদ খিজির হুসাইন-এর **নকজু কিতাবিল ইসলাম ওয়া উসুলুল হকুম**^{২৬} নামক কিতাব। তিউনিশীয় আলিম শাইখ মুহাম্মাদ তাহের ইবনে আসুরও গ্রন্থটির জবাব লেখেন।

বিষয়টি কেবল তাত্ত্বিক যুক্তি খণ্ডন ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না; বরং তা আরও কঠোর ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হলো। শাইখ আবদুর রাজ্জাকও তার গ্রন্থের প্রতি উত্থাপিত অভিযোগসমূহ খতিয়ে দেখতে শাইখুল আজহারের নেতৃত্বে আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘হায়আতু কিবারিল উলামা’ (উচ্চ উলামা পরিষদ) ২৪ জন সদস্যসহ ১৯২৫ সালের আগস্ট মাসে বৈঠকে বসে। পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, গ্রন্থটিতে ইসলামবিরোধী ব্যাখ্যা রয়েছে। আর এখানে লেখক এমন এক পথ অবলম্বন করেন, যা একজন আলিম তো দূরের কথা, সাধারণ মুসলিম থেকেও আশা করা যায় না। পরিষদ আরও সিদ্ধান্ত নেয়, গ্রন্থটির লেখককে আলিমসমাজ থেকে বের করে দেওয়া হবে, আজহার বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের রেজিস্টার থেকে তার নাম মুছে দেওয়া হবে। একই সাথে তিনি ধর্মীয় ও সাধারণ যেকোনো চাকরির জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।^{২৭}

এই গ্রন্থের স্পর্শকাতর দিক হলো—গ্রন্থটির লেখক একজন আজহারি আলিম। ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ইসলামি শরিয়াহবিরোধী শক্তি গ্রন্থটিকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া শুরু করে এবং

^{২৫} আল ইসলাম ওয়া উসুলুল হকুম, পৃষ্ঠা : ৬৪-৬৫

^{২৬} ১৩৪৪ হিজরি মোতাবেক ১৯২৬ সালে কায়রোতে প্রকাশিত হয়।

^{২৭} ১৩৪৪ হিজরি মোতাবেক ১৯২৬ সালে কায়রোতে সালাফিয়া প্রকাশনী গ্রন্থটি প্রকাশ করে।

^{২৮} হকুম হাইয়াতি কিবারিল উলামা ফি কিতাবি আল ইসলাম ওয়া উসুলুল হকুম, ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ৩১-৩২।

ফুলিয়ে-পাপিয়ে প্রচার করতে থাকে। এখনও তারা অত্যন্ত গুরুত্ব ও বিস্ময়ের সাথে গ্রন্থটি নিয়ে আলোচনা করে।

অবশ্য গ্রন্থটি লেখকের জীবদ্দশায় মিশরে একবারও ছাপা হয়নি। ড. মুহাম্মাদ তাঁর বিভিন্ন বইয়ে উল্লেখ করেন, উলটো লেখক উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত ‘ইসলাম কিছু বিধিবিধানসংবলিত একটি ধর্মমাত্র’ এবং ‘রাষ্ট্রপরিচালনার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই’ তার এই মন্তব্যের ব্যাপারে ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি আরও বলেছিলেন, তা একটি শয়তানি মন্তব্য ছিল, যা শয়তান আমার মাধ্যমে উচ্চারণ করিয়েছে। পরে বৈরুতে ড. মুহাম্মাদ হাক্কির মন্তব্য ও টীকাসহ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

মিন হুনা নাবদাআ নামক গ্রন্থ : প্রায় ২৫ বছর পর আরেক বিখ্যাত আজহারি লেখক খালেদ মুহাম্মাদ খালেদ একই পথে হাঁটলেন। তিনি **মিন হুনা নাবদাআ** নামক একটি বই লিখলেন। সেকুলার ও ইসলামবিদ্বেষীরা বইটি লুফে নেয়। ইতঃপূর্বে তারা যেভাবে শাইখ রাজ্জাকের গ্রন্থটি লুফে নিয়েছিল। শাইখ মুহাম্মাদ গাজালি অন্যদের মতো **মিন হুনা নাআলাম** নামক গ্রন্থ লিখে বইটির জবাব লিখলেন।

তবে শাইখ খালেদ তার বইয়ে উল্লিখিত মুসলিম রাষ্ট্রের ব্যাপারে তার চিন্তাধারা থেকে ফিরে এসেছিলেন এবং রাষ্ট্রে ইসলামের ভূমিকা বিষয়ে **আদ-দাওলাতু ফিল ইসলাম** নামে স্বতন্ত্র আরেকটি বই লেখেন। তাতে তিনি পূর্বের মন্তব্য থেকে নিজের দায়মুক্তির ঘোষণা দেন। সন্দেহ নেই, তিনি একজন স্বাধীন ও সাহসী মানুষ। অতএব, তিনি প্রশংসার দাবিদার।

রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে আলিম ও চিন্তাবিদদের বিভিন্ন রচনাবলি

মিশর, আরব ও মুসলিম বিশ্বে অনেকে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে লেখালেখি করেছেন। **আস-সিয়াসাহ আশ-শরইয়্যা** শিরোনামে লিখেছেন শাইখ আবদুল ওয়াহ্‌হাব খাল্লাফ (১৯৩২), শাইখ আলি খফিফ (১৯৩৫), শাইখ মুহাম্মাদ আল বান্না (১৯৩৭), শাইখুল আজহার শাইখ আবদুর রহমান তাজ (১৯৫৩) প্রমুখ।

অনেক আলিম ও শিক্ষক **নিজামুল হকুম ফিল ইসলাম** শিরোনামে লিখেছেন। যেমন : ড. মুহাম্মাদ ইউসুফ মুসি, শাইখ মুহাম্মাদ সাদেক আরজুন, ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আরবি প্রমুখ। একই শিরোনামে শাইখ মুহাম্মাদ হুরায়দি ও জর্ডানের শাইখ তকি উদ্দিন নাহবানির অনেক লেকচার রয়েছে। আরও আছে ড. মাহমুদ খালেদীর **কাওয়াইদু নিজামিল হকুম ফিল ইসলাম** নামক কিতাব এবং ড. মুহাম্মাদ ফারুক নাহবানের কিতাব, যা কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে।

আন-নিজাম আস-সিয়াসি শিরোনামে দুটি কিতাব রয়েছে। জর্ডানের ড. মুহাম্মাদ আবু ফারেস-এর **আন-নিজাম আস-সিয়াসি ফিল ইসলাম** এবং ড. মুহাম্মাদ সালিম আলওয়া-এর **ফিন নিজাম আস-সিয়াসি আল ইসলামি**।

এক্ষেত্রে **উসতাজ সাদি হাবিব-এর দিরাসাতুন ফি মিনহাজিল ইসলাম আস-সিয়াসি** নামক কিতাবও উল্লেখ করা যায়।

আরও অনেকে বিভিন্ন শিরোনামে রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে লিখেছেন। যেমন : **উসতাজ মুহাম্মাদ আসাদের মিনহাজুল ইসলাম ফিল হকুম**। ড. জিয়া উদ্দিন রিসের **আন-নজরিয়াতুস সিয়াসিয়াহ আল**

ইসলামিয়াহ। ড. সুলাইমান তমাওয়ার আস-সুলতাত আস-সালাস ফিদ-দাসাতিরল আরাবিয়া আল মুআসারাহ ওয়া ফিল ফিকরিস সিয়াসি আল ইসলামি। ইতঃপূর্বে ইমাম হাসানুল বান্না মাশকিলাতুনা ফি দাওয়ারি নিজাম আস-সিয়াসি শিরোনামে লেখালেখি করেছেন। তন্মধ্যে আছে নিজামুল হুকুম। আরও আছে শহিদ আবদুল কাদের আওদার আল মালু ওয়াল হুকুম ফিল ইসলাম ও আল ইসলামু ওয়া আওদাউনা আস-সিয়াসিয়াহ।

শাইখ মুহাম্মাদ গাজালির আল ইসলাম ওয়াল ইসতিবদাদ আস-সিয়াসি ও শাইখ খালেদের জবাবে লিখিত মিন হুনা নাআলাম এবং তাঁর লেখক-জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন কিতাবে লিখিত প্রবন্ধসমূহ। আল্লাহ তাঁকে রহমত করুক।

শহিদ সাইয়েদ কুতুবের আস-সালামুল আলমি ওয়াল ইসলাম। অর্থনীতি বিষয়ে আল আদালাতুল ইজতিমায়িয়াহ ফিল ইসলাম ও মারকাতুল ইসলাম ওয়ার রাসুমালিয়াহ।

ড. আলি জরিসার আল মাশরুয়িয়াতুল উলয়া ফিল ইসলাম ও আল কুরআনু ফাওকাদ দাসতুর।

ড. মুহাম্মাদ আমরার আল ইসলামু ওয়াস সিয়াসাতু ওয়াস সুলতাতু ওয়াল আলমানিয়াতু। উসতাজ ফাহমি হুয়াইদির আল কুরআনু ওয়াস সুলতানু ও মুয়াতিনুন লা জিম্মিয়্যুন। ড. মুস্তফা আস-সিবায়ির আদ-দ্বীনু ওয়াদ দাওলাতু ফিল ইসলাম। উসতাজ তারেক বিশরির আল মাসয়ালাতুল ইসলামিয়াহ আল মুয়াসারা।

‘নিজামুল ইসলাম’ শিরোনামে উসতাজ মুহাম্মাদ মোবারকের আল হুকুমু ওয়াদ দাওলাতু। ইসলাম ও সামসময়িক সমাজ নিয়ে ড. মুহাম্মাদ বহির আল হুকুমু ওয়াদ দাওলাতু। ড. মুস্তফা কামাল ওয়াসফির মুসান্নাফাতুন নুজুম আল ইসলামিয়াহ।

ড. মুহাম্মাদ সালাম মাদকুর-এর মাআলিমুদ দাওলা আল ইসলামিয়াহ। ড. মুহাম্মাদ ফাতহি উসমান-এর দাওলাতুল ফিকর। ড. ফাতহি আবদুল করিমের আদ-দাওলা ওয়াস সিয়াদাহ ফিল ফিকহিল ইসলামি। ড. ইয়াহইয়া ইসমাইলের মানহাজুস সুন্নাহ ফিল আলাকাতি বাইনাল হাকিমি ওয়াল মাহকুমি।

উপরিউক্ত বিষয়ে ড. আবদুল হামিদ মুতাওয়াল্লির বেশ কয়েকটি বই রয়েছে। তন্মধ্যে মাবাদিউ নিজামিল হুকুম ফিল ইসলাম অন্যতম। বইটি পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় এক হাজার। বইটিতে তিনি আল ইসলাম ওয়া উসুলুল হুকুম গ্রন্থের জবাব দিয়েছেন। লেখকের অন্যান্য বইয়ের মধ্যে আছে, আজমাতুল ফিকর আস-সিয়াসি আল ইসলামি ও আশ-শরিয়াতু কামাসদারিন আসাসিয়্যিন লিদ-দাসতুর, যদিও ড. মুতাওয়াল্লির কিছু চিন্তাধারার পর্যালোচনা প্রয়োজন।

ড. তাওফিক শাওয়ারি ফিকহুস শুরা ওয়াল ইসতিশারা। ড. আবদুল হামিদ আনসারির আশ-শুরা ওয়াদ দেমুকরাতিয়াহ। ড. হানি দারদিরির নিজামুশ শুরা আল ইসলামিয়াহ মুক্কারিনান লিদ দেমুকরাতিয়াহ আন-নিয়াবিয়াহ আল মুআসারাহ।

ড. রাফাত উসমানের রিআসাতুদ দাওলা ফিল ফিকহিল ইসলামি। ড. আবদুর রহিম জায়দানের আহকামুস জিম্মিয়্যিন ওয়াল মুসতামিনি ফি দারিল ইসলাম এবং তাঁর ছোটো পুস্তিকা আল ফারদু ওয়াদ দাওলাতু ফিল ইসলাম।

পাকিস্তানে অনেকে উপরিউক্ত বিষয়ে লেখালেখি করেছেন। তাদের সর্বাগ্রে রয়েছেন, পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশে ‘জামায়াতে ইসলামি’র প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা আবুল আলা মওদুদী (রহ.)। তাঁর অনেক প্রবন্ধ রয়েছে, যেগুলো *নজরিয়াতুল ইসলাম ওয়া হাদয়িহি ফিস সিয়াসাহ ওয়াদ দাসতুর* নামক কিতাবে একত্র করা হয়েছে। কিতাবটি লেখকের যে সমস্ত প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করেছে, তা হলো—*নজরিয়াতুল ইসলাম আস-সিয়াসিয়াহ, মিনহাজুল ইনকিলাব আস-সালামি, আল কানুনুল ইসলামি ওয়া তুরুকু তানফিজিহি, হুকুকু আহলিজ জিম্মাহ ও তাদওয়িনুদ দাসতুর আল ইসলামি*।

রাষ্ট্রনীতি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত আরও অনেক বিষয় রয়েছে। যেমন : মানবাধিকার। এ বিষয়ে অনেকে লিখেছেন। ড. ফাতহি উসমান, শাইখ মুহাম্মাদ গাজালি, ড. জামাল উদ্দিন আতিয়াহ, ড. কুতুব তবলিয়া ও ড. মুহাম্মাদ প্রমুখ।

রাষ্ট্রনীতি সংশ্লিষ্ট অপর একটি বিষয় হলো, সাধারণ স্বাধীনতা। এ বিষয়েও অনেকে লিখেছেন। তন্মধ্যে শাইখ রাশিদ গানুশির *আল হুররিয়াত আল আম্মাহ* উল্লেখযোগ্য।

রাষ্ট্রনীতি সংশ্লিষ্ট অপর একটি বিষয় হলো, হিসবাহ তথা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ। প্রাচীন ও আধুনিক কালের অনেকেই হিসবাহ নিয়ে লিখেছেন।

জিহাদ, সন্ধি, যুদ্ধ ও অমুসলিমের সাথে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়েও অনেকে বই রয়েছে। যেমন : শাইখ মুহাম্মাদ আবু জুহরার *আল ওয়াহদাতুল ইসলামিয়াহ ও আল আলাকাত আদ-দুআলিয়াহ ফিল ইসলাম*। ড. ওয়াহবা আজ-জুহাইলির *আসারুল হারব ফিল ইসলাম*। এসব বিষয়ে আমি অধমেরও বেশ কয়েকটি বই রয়েছে। যেমন : *গাইরুল মুসলিমিন ফিল মুজতামায়িল ইসলামি*। ইসলাম ও মুসলিমদের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আমার বই *ফাতাওয়া মুআসারা, সেক্যুলারদের যুক্তি খণ্ডনে আমার বই আল ইসলামু ওয়াল আলমানিয়াতু, মিন ফিকহিদ দাওলা ফিল ইসলাম ও আল উম্মাহ আল ইসলামিয়াহ হাকিকাতুন লা ওয়াহমুনসহ* বিভিন্ন কিতাবে ছড়িয়ে থাকা আমার লিখিত নানা প্রবন্ধসমূহ।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয়, মুসলিমরা তাদের শরিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক রাষ্ট্রনীতিকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছিল।

আধুনিক রাষ্ট্রপরিচালনায় যে পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত

এ বিষয়ে গবেষণা ও স্টাডিসমূহকে পরিপূর্ণ এবং যথোপযুক্ত বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে দুটি মৌলিক বিষয় গুরুত্বপূর্ণ।

এক. মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং স্বচ্ছ উৎস থেকে বিধিবিধান গ্রহণ। পাশাপাশি ইসলামি ফিকহের সকল মাজহাব এবং মাজহাববহির্ভূত অন্যান্য চিন্তাধারা তথা সাহাবি ও তাবেয়িদের মতামত থেকে উপকৃত হওয়া, যারা মাজহাবের ইমামদের শাইখ এবং তাঁদের শাইখদের শাইখ।

দুই. সামসময়িক পরিস্থিতি আমলে নেওয়া এবং শরিয়ার আলোকে আধুনিক সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ। কেননা, শরিয়াহ বাস্তবতাকে কখনো অবহেলা করে না; বরং বাস্তবতার

চিকিৎসা করে। ইবনুল কাইয়্যিমের ভাষ্য অনুযায়ী— প্রকৃত ফকিহ তিনিই, যিনি দায়িত্ব-কর্তব্য ও বাস্তবতার মাঝে সমন্বয় ঘটান। মুহাক্কিক আলিমরা বলেছেন, স্থান-কাল-পরিস্থিতিভেদে ফতোয়ার পরিবর্তন ঘটে। তবে এর অর্থ এই নয়, আধুনিক পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে আমরা ইসলামের বিকৃতি সাধন করব। আল্লাহকে প্রতিপালক, ইসলামকে দীন, কুরআনকে সংবিধান ও মুহাম্মাদ (সা.)-কে রাসূল হিসেবে গ্রহণকারী কোনো মুসলিম এমন কথা বলতে পারে না।

মূলত আমরা সামগ্রিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের আলোকে আংশিক নসসমূহকে^{২৮} বুঝতে চাই। পার্থক্য করতে চাই স্থায়ী ও অস্থায়ী বিধানের মধ্যে। তৎকালীন সময় পরিবেশ-পরিস্থিতি ও নিজ জাতির মন-মানসিকতা অনুযায়ী শাসক হিসেবে রাসূল (সা.)-এর কথা ও কাজ এবং কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের জন্য স্থায়ী ও সাধারণ বিধান প্রণয়নে আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর কথা ও কাজের মধ্যে পার্থক্য করতে চাই। অবশ্য তা গভীর অনুসন্ধান ও যথাযথ গবেষণার দাবি রাখে। একইভাবে আমরা সাহাবি ও খোলাফায়ে রাশেদিনগণের কথা ও কাজকে অগ্রাধিকার দিতে চাই। মূলত বিষয়টা আমাদের পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে বুঝতে হবে। স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল বিধানের মধ্যে মিশ্রণ করা যাবে না।

এই ‘দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সঠিক ফিকহ’ আমাদের শরিয়াহকে সামসময়িক সমাজের সকল চাহিদা পূরণ, অনেক মানুষের দ্বিধান্বিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান এবং কঠিন সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধান প্রদানে উপযোগী করে তুলেছে। এসব বিষয় সাধারণত ভারসাম্যপূর্ণ ফিকহের মুখাপেক্ষী। এমন ফিকহে মৌলিক বিষয়ে অবহেলা ও অতিরিক্ত বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা হয় না। একই সাথে ফিকহ যৌক্তিক ও বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত বিষয়ে গাফিল নয়। অতএব, সে ফিকহ এই বিশাল গণ্ডির মধ্যে চলাফেরা করতে থাকে।

শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতির তাৎপর্য

আমরা যে রাষ্ট্রনীতি নিয়ে কথা বলছি, তা হলো শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি। যে বিষয়ে প্রাচীন ও আধুনিক কালের আলিমগণ বইপুস্তক লিখেছেন।

এটা স্পষ্ট ও ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই যে, শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি বলতে সেই রাষ্ট্রনীতিকে বোঝানো হয়, যার ভিত্তিসমূহ শরিয়ার বিধিবিধান ও দিকনির্দেশনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সকল প্রকার রাষ্ট্রনীতি শরিয়াহভিত্তিক নয়। অনেক রাষ্ট্রনীতি শরিয়াহবিরোধী। আবার অনেক রাষ্ট্রনীতিই শরিয়াহকে পরোয়া করে না। শরিয়াহ কি এ রাষ্ট্রনীতি নিয়ে সন্তুষ্ট নাকি অসন্তুষ্ট? শরিয়াহ কি এ রাষ্ট্রনীতিকে গ্রহণ করে না প্রত্যাখ্যান? মূলত এসব রাষ্ট্রনীতি রাজনীতিকদের ধ্যানধারণা অনুযায়ী চলতে থাকে।

তাদের অনেকেই নির্দিষ্ট কিছু দর্শন ও চিন্তাধারা ধারণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। যেমন, আধুনিক কালের সেকুলারগণ। তারা উদার ডানপন্থি হোক কিংবা মার্কসবাদী বামপন্থি। আবার

^{২৮} কুরআন ও হাদিসের মূলভাষ্যকে নস বলে।

তাদের অনেকেই পূর্বপুরুষ বা নেতাদের থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রীতিনীতি অনুসরণ করে। নিজেকে একবারও প্রশ্ন করে না, রীতিনীতিগুলো কী শরিয়াহভিত্তিক না শরিয়াহবিরোধী?

তাদের অনেকেই নিজ স্বার্থ ও মনোবৃত্তির অনুসরণ করে এবং ক্ষমতায় চিরস্থায়ী থেকে যেতে চায়। তাদের কাছে উম্মাহর স্বার্থ, আশা-আকাজ্জা, মান-মর্যাদা, আকিদা-বিশ্বাস কোনো গুরুত্ব রাখে না।

এসব রাষ্ট্রনীতিকে শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি বলা যায় না। শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি হলো তা-ই, যা শরিয়াহ থেকে চলার পথ খুঁজে নেয় এবং শরিয়ার কাছে প্রত্যাবর্তন করে। পৃথিবীর জমিনে শরিয়াহ বাস্তবায়ন ও মানুষের মাঝে শরিয়ার মৌলিক শিক্ষা সুদৃঢ়করণ ইত্যাদিকে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে। শরিয়াহকে শুধু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবেই নয়; বরং চলার পথ ও পাথেয় হিসেবেও গ্রহণ করে। এ রাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও শরিয়াহভিত্তিক এবং কর্মপন্থাও শরিয়াহভিত্তিক।

এটাই হচ্ছে কাক্ষিত রাষ্ট্রনীতি, যার চলার পথ শরিয়াহভিত্তিক। লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং কর্মপন্থাও শরিয়াহভিত্তিক। কিন্তু আমি ‘সিয়াসাহ’ (রাজনীতি/ রাষ্ট্রনীতি) শব্দের ব্যাখ্যা করতে চাই। কেননা, কিছু মানুষ শব্দটিকে অপছন্দ করে; এমনকি তারা ইসলামে রাজনীতির উপস্থিতিতে অস্বীকার, আর যারা ‘ইসলাম হলো ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বয়’-এর কথা বলে, তাদের কথার বাণে জর্জরিত করে। নিন্দা ও তিরস্কার করে বলে, তারা তো ধর্ম ও রাজনীতির মাঝে মিশ্রণ করে ফেলেছে। একবার কোনো এক নেতা বলেন, রাজনীতিতে ধর্মের কোনো অস্তিত্ব নেই এবং ধর্মে কোনো রাজনীতির কোনো অস্তিত্ব নেই। ফলে পাশ্চাত্যপন্থি ও তাদের অনুসারীরা যেসব সেকুলার পরিভাষা মুখে মুখে আওড়ায়, ‘রাজনৈতিক ইসলাম’ (Political Islam) নামক পরিভাষাটিও সেসব পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তারা এই পরিভাষা দ্বারা ওই ইসলামকে বোঝায়, যা সুফিবাদ ও আচার-অনুষ্ঠানের গাণ্ডি থেকে বের হয়ে এসে ঘোষণা দেয়—ইসলাম হলো আকিদা ও শরিয়াহ, দ্বীন ও রাষ্ট্র, সত্য ও সামর্থ্য, ইবাদত, নেতৃত্ব ও কুরআন এবং তরবারির সমন্বয়।

এক্ষেত্রে হয়তো সামসময়িক রাজনীতিতে ম্যাকিয়াভ্যালি^{২৯} দর্শনের প্রাধান্য রসদ জুগিয়েছে। অথচ এই দর্শনের ভিত্তিই হলো নীতি-নৈতিকতাহীনতার ওপর। ম্যাকিয়াভ্যালি দর্শনের মূলকথা হলো—উদ্দেশ্য মহৎ হলে তা অর্জনে যেকোনো ধরনের উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা যাবে। অতএব, লক্ষ্য পূরণে ধোঁকাবাজি, মিথ্যা বলা ও সকল প্রকার নিন্দনীয় কাজ বৈধ। শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করতে নারী, মদ ইত্যাদির ব্যবহার করা জায়েজ। পাশাপাশি রক্তপাত, মানব-নির্যাতন, শত্রুর বিরুদ্ধে আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবহার, স্বজনপ্রীতিসহ সমাজে প্রচলিত সব ধরনের নিন্দনীয় উপায় অবলম্বন বৈধ। ইতঃপূর্বে এই দর্শনকে নাৎসিবাদী, ফ্যাসিবাদী ও সাম্যবাদীরা ব্যবহার করেছে; এমনকি অনেক উদার সংগঠনও এই অশুভ দর্শনের ওপর নির্ভর করে।

^{২৯} নিকোলো ম্যাকিয়াভ্যালি ১৪৬৯-১৫২৭ : ইতালীয় দার্শনিক, কূটনীতিক, ইতিহাসবিদ ও লেখক। তাকে অনেকেই আধুনিক রাজনৈতিক দর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক বলে থাকেন। *দ্যা প্রিন্স*, *ডিসকোর্সেস* ও *দ্যা আর্ট অব ওয়ার* তার অন্যতম রচনাবলি।

হয়তো এ কারণেই শাইখ মুহাম্মাদ আবদুহ্ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি নিজেকে রাজনীতি, রাজনীতির কলাকৌশল ও রাজনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয় থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন। এজন্য তিনি বলেন—আমি রাজনীতি, যে রাজনীতি করে, রাজনীতিবিদ ও রাজনীতির স্বীকার ব্যক্তি; সবার কাছ থেকে পানাহ চাই।

সিয়াসাহ শব্দের শাব্দিক অর্থ

‘সিয়াসাহ’ শব্দটি (ساسة - يسوس - فهو سائس) ক্রিয়ার ক্রিয়ামূল। এটি নিঃসন্দেহে আরবি শব্দ। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো—অনেকের ধারণা শব্দটি আরবি ভাষায় অনুপ্রবেশকারী অনারব শব্দ। আমি প্রত্যুত্তরে ইবনে মানজুর আফ্রিকির লিসানুল আরব-এর নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি উল্লেখ করা যথেষ্ট মনে করছি। তিনি সিয়াসাহ (سوس) শব্দমূলের ব্যাখ্যায় বলেন—

(السوس) শব্দের অর্থ নেতৃত্ব। যেমন : বলা হয় (ساسوهم سوسا) অর্থাৎ তারা তাদের নেতৃত্ব দিয়েছে। যদি তারা কাউকে নেতা বানায়, তখন বলা হয় (سوسوه و أساسوه) অর্থাৎ তারা তাকে নেতা বানিয়েছে। তেমনি (و ساس الأمر سياسة) এর অর্থ, তিনি বিষয়টির দায়িত্ব নিয়েছেন। যে ব্যক্তি জাতিকে নেতৃত্ব দেয়, তাকে ساسة বা سواس বলা হয়। কবি সালাব বলেন—

سادة قادة لكل جميع * ساسة للرجال يوم القتال

‘প্রত্যেকের নেতা ও প্রধানরাই যুদ্ধের ময়দানে সৈনিকদের নেতৃত্বদানকারী।’

অর্থাৎ (سوس فلان أمر بني فلان) অর্থাৎ তারা তাকে নেতৃত্বের ভার দিয়েছে। (سوسه القوم) অর্থাৎ তারা তাকে তাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জওহারি বলেন—(سست الرعية سياسة و) অর্থাৎ লোকটিকে জনগণ ও মানুষ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কবি হুতাইয়া বলেন—

لقد سوست أمر بنيك * حتي تركتهم أدق من الطحين

‘তুমি তোমার গোত্রের দায়িত্বভার পেয়েছিলে, কিন্তু তুমি তাদের আটার চেয়েও চূর্ণ অবস্থায় ছেড়ে দিলে।’

ফাররা বলেন—(فلان مجرب قد سيس و ساس عليه) অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি অভিজ্ঞ, সে নেতা বানিয়েছে এবং তাকে নেতা বানানো হয়েছে। হাদিসে এসেছে (كان بنو إسرائيل تسوسهم أنبيائهم) অর্থাৎ নবির বা ইসরাইলকে পরিচালনা করত, যেভাবে রাজা-বাদশারা প্রজাদের পরিচালনা করে।^{৩০}

^{৩০} আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত ‘মুত্তাফাকুন আলাইহি’ হাদিসটি ইমাম বুখারি ‘আল আম্মিয়া’ অধ্যায়ে ও ইমাম মুসলিম ‘আল ইমারাহ’ অধ্যায়ে বর্ণনা করেন। আল লুলু ওয়াল মারজান : ১২০৮।

অতএব, ‘সিয়াসাহ’ (রাজনীতি/রাষ্ট্রনীতি) শব্দের অর্থ হলো, কল্যাণার্থে কোনো কিছু দায়িত্ব নেওয়া এবং রাজনীতিবিদের কর্মকাণ্ড। বলা হয় (هو يسوس الدواب) যখন সে পশুর ওপর আরোহণ করে এবং পোষ মানায়। আর শাসক জনগণের দেখভাল করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়, ‘সিয়াসাহ’ শব্দটি খাঁটি আরবি শব্দ। এতে কোনো সন্দেহ-সংশয় নেই। ‘সিয়াসাহ’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জনগণের কল্যাণার্থে তাদের বিভিন্ন বিষয়াদি পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়া।

এদিকে শরিয়াহ শব্দের পরিচয় প্রদান বাকি থাকল। শরিয়াহ শব্দের অর্থ কী? উদ্দেশ্য কী?

এতে কোনো মতবিরোধ নেই যে, শরিয়াহ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—ওই বিষয়, যা শরিয়াহ থেকে চলার দিকনির্দেশনা গ্রহণ করে, শরিয়াহকে প্রধান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও একমাত্র উৎস হিসেবে মান্য এবং শরিয়াহ থেকে কর্মপন্থা গ্রহণ করে। ইতঃপূর্বে এ বিষয়ে কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছি।

রাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হওয়ার মাপকাঠি

এই স্পর্শকাতর বিষয়ে গবেষকদের সামনে একটি প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়। তা হলো—রাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হওয়ার অন্যতম মাপকাঠি ও মানদণ্ড ‘শরিয়াহ’ শব্দের তাৎপর্য কী, যাতে রাষ্ট্রনীতিটা বাস্তবিকপক্ষে শরিয়াহসম্মত হয়।

কিছু মানুষের অন্তরে ‘শরিয়াহ’ শব্দটি নিয়ে নেতিবাচক ধারণা আছে; বরং ক্ষেত্রবিশেষে ধারণাটি ভীতিকর। তারা শরিয়াহ বলতে বোঝে ‘হলুদ বইসমূহ’^{৩১}—তে উল্লিখিত, মাজহাবের অনুকরণকারী, মুতাআখখিরিন (পরবর্তী যুগের) আলিমদের কিছু কথার সমষ্টি। যে কথামালা সে যুগের প্রতিনিধিত্ব করে, যে যুগে ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি পিছিয়ে পড়েছিল। অকেজো হয়ে পড়েছিল বিবেকবুদ্ধি। চিন্তা-গবেষণা, শিল্প-সাহিত্য ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী স্পৃহা অনুপস্থিত ছিল। মানবজীবন হয়ে পড়েছিল নিশ্চল। সব ক্ষেত্রে অন্ধ অনুকরণ ও স্থবিরতা প্রাধান্য পেয়েছিল। এমনকি একটি প্রবাদ বাক্যের প্রচলন শুরু হয়েছিল—নতুন করে এমন কোনো কিছু আবিষ্কার করা সম্ভব নয়, যা পূর্বের চেয়ে উত্তম হবে। পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের (নতুন করে আবিষ্কারের) জন্য কোনো বিষয় রেখে যাননি।

কিছু লোক মনে করে পূর্বের যুগের প্রতিনিধিত্বকারী এসব কথাবার্তাই শরিয়াহ। এর বাইরে কোনো শরিয়াহ নেই। অথচ এসব কথামালাই তৎকালীন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরোয়া করত না, তাহলে তা আমাদের এমন যুগের জন্য কীভাবে প্রযোজ্য হবে, যে যুগ আগের যুগের চেয়ে একদম ভিন্ন। যদি তখনকার যুগের কোনো ব্যক্তিকে বর্তমান যুগে উপস্থিত করা হয় এবং সে আমাদের জীবনযাপনের মান অবলোকন করে, তাহলে সে তার কল্পনাভীত দৃশ্যাবলি দেখে

^{৩১} হলুদ বইসমূহ (الكتب الصفراء) বলতে প্রাচীন বইপুস্তককে বোঝানো হয়। কেননা, প্রাচীন বইপুস্তক হলুদ বর্ণের কাগজে লেখা হতো। তেমনি এসব বইয়ের পাঠকদের সেকেলে ধ্যানধারণা অধিকারী মনে করা হয়।

পাগল হয়ে যাবে। যেসব দৃশ্য কল্পনার জগতে হাবুডুবু খাওয়া কবি-সাহিত্যিকদের অন্তরে কখনো উদয় হয়নি।

কিছু লোক নসের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে শরিয়াহ বলতে শুধু স্থবিরতা বোঝে। তারা নসকে শাব্দিকভাবে বোঝে। নসের নিগূঢ় রহস্য ও মূল উদ্দেশ্য উদ্ঘাটনে শ্রম ব্যয় করে না। সমন্বয় সাধন করে না প্রাসঙ্গিক নস ও সামগ্রিক নসের মধ্যে। নসকে ইসলামের মৌলিক বিধিবিধান ও প্রধান প্রধান লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত করে না। বিষয়সমূহ পরস্পর সাংঘর্ষিক হওয়াকে পরোয়া করে না, কেবল খণ্ডিত নসকে আঁকড়ে ধরে।

এভাবে নব্য জাহিরিয়ারা বিস্তৃত দিগন্ত, চমৎকার বিধিবিধান, ন্যায়সংগত হুকুম-আহকাম ও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও শরিয়াহকে সেই রূপে কল্পনা করে, যে শরিয়াহ জীবনকে স্থবির করে দেয়, উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে এবং চোখ ধাঁধানো, বিবেক হতবুদ্ধিকারী এবং নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী বৈশ্বিক কাফেলা থেকে পিছিয়ে পড়ে।

নিশ্চয় শরিয়ার এই কল্পিত রূপটি সেই প্রকৃত রূপ নয়, যে রূপকে আমরা জানি ও বিশ্বাস করি। সেই রূপ নয়, যার দিকে আমরা আহ্বান করি এবং কুরআন-সুন্নাহে যার বর্ণনা এসেছে, আর সাহাবি ও তাবেরিনরা যে শরিয়াহকে বুঝেছে। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা শরিয়াহকে কঠোরতার পরিবর্তে সহজকরণ, জোরজবরদস্তির পরিবর্তে হালকাকরণ এবং চাপ প্রয়োগের পরিবর্তে কষ্ট দূরীভূতকরণের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন, আল্লাহ বলেন—

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ-

‘আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান। তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না।’^{৩২}

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا-

‘আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। কারণ, মানুষকে দুর্বল করে সৃজন করা হয়েছে।’^{৩৩}

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ-

‘আল্লাহ তোমাদের অসুবিধায় ফেলতে চান না; কিন্তু তোমাদের পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নিয়ামত পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।’^{৩৪}

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ-

‘তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের ওপর কোনো কষ্ট চাপিয়ে দেননি।’^{৩৫}

৩২ সূরা বাকারা : ১৮৫

৩৩ সূরা নিসা : ২৮

৩৪ সূরা মায়দা : ৬

নিম্নে সহজকরণের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো :

শরিয়াহ আজিমত (আবশ্যিক বিধান)-এর বিপরীতে রুখসত (ছাড়)-এর বৈধতা দিয়েছেন। যেমন : হাদিসে এসেছে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর অবকাশ দেওয়া কাজগুলো কার্যকর হওয়া পছন্দ করেন। যেমন, তিনি তাঁর অবাধ্যতাকে অপছন্দ করেন।^{৩৬} অপর এক হাদিসে এসেছে—মহান আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তাঁর অনুমতিসমূহ গ্রহণ করা হোক; যেমন তিনি পছন্দ করেন, তাঁর ফরজসমূহ পালন করা হোক।^{৩৭}

শরিয়াহ প্রয়োজনের সময় নিষিদ্ধ বস্তুকে বৈধ করেছে। যেমন : আল্লাহ তায়ালা মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত ও আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যের জন্য জবাইকৃত পশু হারাম করার পর বলেন—

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

‘অবশ্য যে লোক অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালঙ্ঘন না করে তা গ্রহণে নিরুপায় হলে, তার পাপ হবে না।। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাক্ষমশীল, অত্যন্ত দয়ালু।’^{৩৮}

‘শরিয়াহ’ বিভিন্ন বিষয়ে এবং লক্ষ্যে পৌঁছতে ক্রমধারা অবলম্বন করেছেন, যেটা আমরা ইসলামের সূচনালগ্নে বিভিন্ন বিধান প্রণয়নকালে দেখেছি। ইসলাম ফরজ বিধানসমূহ আবশ্যিক এবং হারাম বিষয় নিষিদ্ধ করার সময় ক্রমধারা অবলম্বন করেছে। যেমন : শরিয় বিধান প্রণয়নের ইতিহাসে সালাত ও রোজা আবশ্যিককরণ এবং মদপান নিষিদ্ধের সময় ধারাবাহিকতা অবলম্বনের বিষয়টা বেশ পরিচিত।

শরিয়াহ দুটি মন্দ ও ক্ষতিকর কাজের মধ্যে লঘুতর মন্দ কাজে লিপ্ত হওয়াকে বৈধতা দিয়েছে। অতএব, ছোটো ও নির্দিষ্ট ক্ষতি বহনের মাধ্যমে ব্যাপক ও বড়ো ক্ষতির মোকাবিলা করা যাবে। একইভাবে বড়ো স্বার্থ অর্জনের জন্য ছোটো স্বার্থ ত্যাগ এবং বড়ো অন্যায় রুখতে ছোটো অন্যায় দেখে চুপ থাকা যাবে।

স্বাভাবিক অবস্থায় যা অবৈধ, জোরজবরদস্তির সময় শরিয়াহ তা বৈধ করেছে; এমনকি জোরজবরদস্তির সময় দায়িত্বশীল হওয়ার মূল উপাদান ‘আত্মনিয়ন্ত্রণের ভার’ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। হাদিসে এসেছে—‘আল্লাহ আমার উম্মতকে ভুল, বিস্মৃতি ও জোরপূর্বকৃত কাজের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।’^{৩৯} একইভাবে জোরজবরদস্তির স্বীকার ব্যক্তির জন্য কুফরি বাক্য

^{৩৫} সূরা হজ : ৭৮

^{৩৬} ইমাম আহমাদ, ইবনে হিব্বান ও বায়হাকি হাদিসটি ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তেমনি হাদিসটি সহিহুল জামে আস-সগির-এ বর্ণিত হয়েছে ১৮৮৬।

^{৩৭} ইমাম তিরমিজি, ইমাম হাকিম হাদিসটি ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। সহিহুল জামে আস-সগির হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলেছে, ১৮৮৭।

^{৩৮} সূরা বাকারা : ১৭৩

^{৩৯} হাদিসটি ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন : সুনানে ইবনে মাজাহ ২০৪৫, সহিহ ইবনে হিব্বান ৭২১৯, মুসতাদরাকে হাকিম ২/১৯৭ ও সুনানে বায়হাকি ৭/৩৫৭। আরও দেখুন, জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম কিতাবে ৩৯ নম্বর হাদিসের ব্যাপারে ইবনে রজব (রহ.)-এর মন্তব্য। হাদিসটির মর্মার্থ সন্দেহাতীতভাবে কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। সূরা বাকারার ২৮৬ নং আয়াতে, সূরা আহজাবের ৫ নং আয়াতে, সূরা নাহলের ১০৬ নং আয়াতে এবং সূরা আলে ইমরানের ২৮ নং আয়াতে একই বক্তব্য রয়েছে।

উচ্চারণকে কুরআন বৈধ করেছে এবং এতে তার ঈমানের কোনো ক্ষতি হবে না। যেমন, আল্লাহ বলেন—

مَنْ أْكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ-

‘যাকে (কুফরির জন্য) বাধ্য করা হয়েছে এবং যার হৃদয় ঈমানের ওপর অটল থাকে, সে ব্যতীত।^{৪০}

^{৪০} সূরা নাহল : ১০৬